Reflection of Marginality in Bhagirath Mishra's Novel: *Charanbhumi*

ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাসে প্রান্তিকতার প্রতিচ্ছবি: চারণভূমি

Research Review Journal of Interdisciplinary Studies
double-blind peer-reviewed and refereed online quarterly Journal
ISSN (online): 3108-0472
2(1) 8-16, 2026
©The Author(s) 2026
10.31305/rrjis.2026.v2.n1.002
https://rrjournals.in/

Received: 13 Dec, 2025
Revised: 25 Feb, 2026
Accepted: 27 Feb, 2026
Published: 31 Mar, 2026

*Dr. Kanika Sarkar

Research Scholar, Dept. of Bengali, Bankura University, W.B.

Abstract: *Bhagirath Mishra is an exceptional figure in writing literature centered on the lives of the subaltern classes. By focusing on rural life, he pioneered a new path in depicting the rise and fall of marginalized communities. In the novel Charanbhumi, the author brings to light the unknown life stories of the "Bherihar" community. The Bherihars are a group of sheep herders who lead a nomadic lifestyle. These shepherds are known as "Bhakat." They wander across a vast region stretching from Ranchi and Hazaribagh in the west to Hooghly in the east, covering large parts of Bengal and Bihar, moving continuously for years and generations. However, the Bherihars are not the actual owners of the sheep. They take loans (advance payments) from the owners and are engaged in sheep rearing. This debt grows at a compound rate in such a way that they are never able to free themselves from it throughout their lives. The open fields serve as their homes, and as a result, they remain bound by certain customs and rituals. For instance, they observe the ritual of "Magh-Shiri Panchami" for the first shearing of sheep wool of the season. The lives of the Bherihars are deeply intertwined with the cycle of seasons. During the monsoon, they cannot survive in the open plains with their sheep, and are forced to take shelter in hills or caves, making their lives even more difficult. In reality, those who are socially categorized as lower caste are also economically oppressed and have been exploited by the ruling classes for generations. Although the nature of this oppression has changed over time, it continues to persist in different forms. Through this novel, I want to focus to portray the lives of those marginalized (Apankteya), oppressed, and dispossessed communities who remain excluded from mainstream from the society.*

Keywords: *Bherihar, Bhakat, Magh-Shiri Panchami, Apankteya, subaltern class, Sidhapati.*

Abstract in Bengali: *ভাগীরথ মিশ্র প্রান্তিক মানুষের জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে তিনি প্রান্তিক সমাজের উত্থান-পতনের চিত্রায়ণে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন। তাঁর উপন্যাস চারণভূমি-তে তিনি "ভেরিহার" সম্প্রদায়ের অজানা জীবনকথা তুলে ধরেছেন। ভেরিহাররা মূলত এক যাযাবর জীবনযাপনকারী ভেড়া পালনকারী সম্প্রদায়। এদের "ভকত" নামেও ডাকা হয়। তারা পশ্চিমে রাঁচি ও*

*Corresponding Author
Dr. Kanika Sarkar, Research Scholar, Dept. of Bengali, Bankura University, W.B.
kanikasarkar481@gmail.com

Creative Commons Non Commercial CC BY-NC: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 License (http://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits non-Commercial use, reproduction and distribution of the work without further permission provided the original work is attributed.

Scan and Access

হাজারিবাগ থেকে পূর্বে হুগলি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, বাংলার ও বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ঘুরে বেড়ায়। তবে ভেরিহাররা ভেড়ার প্রকৃত মালিক নয়। তারা মালিকদের কাছ থেকে অগ্রিম ঋণ নিয়ে ভেড়া পালন করে। এই ঋণ চক্রবৃদ্ধি হারে এমনভাবে বেড়ে যায় যে, তারা সারাজীবনেও তা শোধ করতে পারে না। খোলা মাঠই তাদের বাসস্থান, ফলে তারা বিভিন্ন প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। যেমন, ভেড়ার প্রথম লোম কাটার সময় "মাঘ-শিরি পঞ্চমী" পালন করা হয়। ভেরিহারদের জীবন ঋতুচক্রের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। বর্ষাকালে খোলা প্রান্তরে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তারা পাহাড় বা গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, যা তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। সমাজে যাদের নিম্নবর্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকেও শোষিত এবং শাসক শ্রেণির দ্বারা যুগের পর যুগ ধরে নিপীড়িত। এই শোষণের ধরন সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হলেও এর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। এই উপন্যাসের মাধ্যমে আমি সেই সকল প্রান্তিক (অপাঙ্‌ক্তেয়), নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের জীবনচিত্র তুলে ধরতে চাই, যারা সমাজের মূলধারার বাইরে রয়ে গেছে।

Keywords: *ভেরিহার, ভকত, মাঘ-শিরি পঞ্চমী, অপাঙ্‌ক্তেয়, প্রান্তিক শ্রেণি, সিদ্ধাপতি।*

সৃষ্টির আদিলগ্নে মানুষের যখন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, তারা বনে বাস করত, জীবনে বেঁচে থাকার জন্য কোন অর্থের প্রয়োজন ছিল না আর সমাজে তখন উচ্চনীচ কোনো ভেদাভেদও ছিল না। এরপর যখন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠল মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ধন-সম্পত্তির প্রয়োজন হল অর্থের কারবার এল তখনই সমাজের শ্রেণি-বৈষম্যের দিকটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করল। অর্থগত দিক থেকে সুকৌশলে একশ্রেণির মানুষকে পিছিয়ে রাখা হল। আবহমানকাল থেকেই সমাজে দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল একটি উৎপাদক শ্রেণি আরেকটি অনুৎপাদক শ্রেণি। নিম্নবর্গের মানুষেরা হল সমাজের উৎপাদক শ্রেণির প্রতিনিধি। আর অনুৎপাদক বলতে উচ্চবর্গের মানুষদের বোঝানো হত। উৎপাদক শ্রেণির শ্রমের ফসল জোরপূর্বক অনুৎপাদক শ্রেণির প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে অনুৎপাদক শ্রেণির ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে শুরু করল এবং উৎপাদক শ্রেণির হাতে কোন ধনসম্পত্তি না থাকার কারণে আর্থিক দিক থেকে আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। এই উৎপাদক শ্রেণিরাই সমাজে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিরূপে পরিচয় পেল, আর তাদেরই নাম হল নিম্নবর্গ। মার্কসের ধারণা অনুযায়ী শ্রেণি নির্ধারণের মাপকাঠি হল অর্থনীতি।

> "Marxist sociology starts from the premise that the primary func- tion of social organization in the satisfaction of basic human needs- food clothing and shelter. Hence, the Productive system is the nucleus around which other elements of society are organized. Contemporary sociology has reversed this emphasis by stressing the distribution system, the stratification components of which are status and prestige. To Marx, however, distribution is a dependent function of production.
>
> Stemming from the assumption of the primacy of production is the Marxist definition of class: Any aggregate of persons who play the same part in the production mechanism. Marx, in Capital, outlined three main classes, differentiated according to relations to the means of production: (1) Capitalists, or owners of the means of production; (2) Workers, or all those who are employed by others; (3) Land owners, who in Marx's theory seemingly differ from Capitalists and are re- garded as survivors of feudalism"[১]

অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দিক থেকেই সমাজে শ্রেণিবিন্যাস হয়।

জন্মগত দিক থেকে যারা নিম্নবর্ণের, অর্থগত দিক থেকে তারাই শাসকশ্রেণির দ্বারা শোষিত হয়ে আসছে। যুগ যুগ ধরে সমাজের উঁচু শ্রেণিতে বসবাসকারী মানুষ দ্বারা এরা বঞ্চিত হয়ে আসছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এরা অপমানিত। আসলে ভারতবর্ষের শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থিক উন্নতি তো কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ যার কারণে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষগুলি সমস্তরকমের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ মত প্রকাশ করেন – "শূদ্রজাতির একে বিদ্যার্জন বা ধনসংগ্রহের সুবিধা বড়ই অল্প, তাহার উপর যদি কালে দুই-একটি অসাধরাণ পুরুষ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হন, অভিজাত সমাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে তুলিয়া লন। তাঁহার বিদ্যার প্রভাব, তাঁহার ধনের ভাগ উচ্চজাতির উপকারে যায়, আর তাঁহার নিজের জাতি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ধনের কিছুই পায় না। শুধু তাহাই নহে, উপরিতন জাতির আবর্জনা রাশিরূপ অকর্মণ্য মনুষ্য সকল শুদ্রবর্গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।"[২] অর্থাৎ আমরা যদি সকলে স্বামীজীর মতো ভাবতে পারি সকলের মধ্যে সমানভাবে ধনসম্পদ বন্টন করে দিতে পারি তাহলে সমাজে বর্ণ বা জাত ও আর্থিক বৈষম্য ঘুচে যেতে পারে। সমাজে যারা আর্থিক দিক থেকে

পিছিয়ে পড়া অর্থাৎ নিম্নশ্রেণি রূপে বিবেচিত হচ্ছে তারাও সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে সভ্য সমাজের কাছে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে পারবে অর্থাৎ জাতি, বর্ণ, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির একটা বিরাট অংশের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে সাহিত্যের মাধ্যমে।

বিশ শতকে সত্তর পরবর্তী সময়কালে যে সব কথা সাহিত্যিক সমাজের পিছিয়েপড়া শ্রেণিদের নিয়ে সাহিত্য রচনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন তাদের মধ্যে ভগীরথ মিশ্র অন্যতম। নাগরিক জীবন থেকে বহুযোজন দূরে সরে এসে গ্রাম্য প্রেক্ষাপটকে আশ্রয় করে নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনের নানান দিক নিয়ে তিনি লিখে গেছেন। লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতাই সমাজের পিছিয়েপড়া শ্রেণিকে নিয়ে লেখালেখি করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। কথাকার ভগীরথ মিশ্র গ্রামের ছেলে। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন – "গ্রামেই আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা আর এমনই সে গ্রাম যেখানে ১৯৯৬-তেও একটি সাপ্তাহিক হাট নেই। গ্রামীণ জীবনের চোরা স্রোতগুলিকে আমি দেখেছি, চেনারও চেষ্টা করেছি। গ্রামীণ মানুষের মানস লোকটি ওই ভুবনের একজন সদস্য হিসেবে যতটুকু চেনা যায় ততটুকুই চিনি।"[৩] লেখকের এই চেনা থেকেই নিম্নবর্গের মানুষের কথা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। তবে গ্রামে থাকলেই যে গ্রামে অবস্থানকারী পিছিয়ে পড়া শ্রেণির দুঃখ-দুর্দশা-অবহেলা নিপীড়িত জীবন সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় তা নয় যদি না তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারা যায়। ভগীরথ মিশ্রের গ্রামের এই মানুষগুলির সঙ্গে ছিল অবাধ মেলামেশা। তাই তিনি এত সহজ, সরল নিখুঁতভাবে তাদের জীবনের কথা তুলে ধরতে পেরেছেন।

লেখকের বেশিরভাগ লেখাতেই লোধা-শবর-ভেড়িহার-কাহার-ডোম সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনালেখ্য রচিত হয়েছে। নিম্নশ্রেণির মানুষের অন্দরমহলে প্রবেশ করে লেখক তাদের ঘরের কথাকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে দিয়েই তার উপন্যাসের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। যদিও লেখকের রাজনৈতিক জীবন লেখকের দেখার ও লেখার ক্ষেত্রে অনেক সাহায্য করেছিল। ভগীরথ মিশ্র ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী রাজনীতির মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এই বিশ্বাস সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে ভালবাসতে, তাদের দুঃখ-কষ্টে-হতাশায় সমব্যথী হতে শিখিয়েছিল। 'চারণভূমি' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বারবার অন্তেবাসী মানুষের কথা উঠে আসে।

চারণভূমি উপন্যাসে ভগীরথ মিশ্র এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের তথা ভেড়িহারদের জীবনচিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এদের কাজ হল ভেড়া চরানো, নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে না, যাযাবরের মত ভেড়ার পাল নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ানোই এদের জীবন। আসলে এদের জীবনে একটা স্বতন্ত্র জগৎ রয়েছে। উপন্যাসে যে ভেড়াদের কথা বলা হয়েছে এরা হল শিংড়ী ভেড়া। এদের জন্ম-মৃত্যু মাঠে। এরা কোন গোঠে জন্মায় না। ভেড়া চরোয়াদের জীবনের বেশিরভাগ সময়টা মাঠেই কেটে যায়। যাকে লেখক তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। উপন্যাসের পটভূমি ও ভেড়িহারদের জীবনযাপনের সে চিত্র ফুটে উঠেছে –

> "পশ্চিমে রাঁচী-হাজারিবাগ, পূবে হুগলি জিলা, বাংলা-বিহারের এই বিশাল এলাকা জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দাহো ভকতের গোঠ। বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। আর, এই ভেড়া জাতেরও ভারি আজীব জীবন। এরা মাঠেই জন্মায়, মাঠেই মরে কিংবা বিক্রী হয়। জীবনে কোনদিন কোনও গোয়ালের মুখ দেখেনি। জন্মাবার পর থেকে শুধু হেঁটে বেড়ায়। হেঁটেই বেড়ায় আজীবন কাল। এদের পিছু পিছু যারা ঘোরে, বাগাল-ম্যাড়াল-ডেরোয়াহার দল, তাদের অবস্থাও একই রকম। গোঠই তাদের ঘর-সংসার, ইহকাল-পরকাল। বিয়ে-সাদি একটা করে হয়ত যে-যার মুলুকে, ক্বচিৎ কদাচিৎ যায়ও ঘরোয়ালির কাছে, আণ্ডা-বাচ্চাও পয়দা হয়, কিন্তু এদের আসল সংসারটি গড়ে ওঠে ফাঁকা জমিনে, টাড়ে-টিপুরে, পাহাড়ে-জঙ্গলে। বছরে হয়ত এক-আধবার গেল মুলুকে, বিবি-বাচ্চার হাল-হদিশ নিয়ে এল, কিছু গেঁহু কিংবা জনার কিনে দিয়ে এল দু'এক মাসের মতো, ব্যাস, ওদের জীবনের বাকি অংশটি পড়ে থাকে গোঠে। ভেড়াদের পেছনে ক্ষয় হয়। ক্ষয় হয় রাস্তার কিনারে, পাহাড়ের ঢালে, রাঁচী থেকে পুরুল্যা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি...। আবার হুগলি থেকে রাঁচী হাজারিবাগ, হাটিয়া, দুমকা....। জীবনচক্রে, ঋতুচক্রে এরা পাক খায় আজীবনকাল, বংশ পরম্পরায়।"[৪]

উপন্যাসে ভকতদের জীবনযাপনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ভেড়া-ভেড়িহারদের জীবন। সম্বৎসর পথ পরিক্রমার মধ্যেই কেটে যায়, ভকতদের জীবন। তবে তাদের পরিক্রমার সঙ্গে ঋতুচক্রের একটা যোগ আছে, কারণ বর্ষাকালে সমতলভূমিতে ভেড়ার পাল নিয়ে থাকা সম্ভব নয়। কোন জমি খালি অবস্থায় থাকে না। এই সময় ভেড়ার গোঠ নিয়ে দুমকা পাহাড় বা পাহাড়ের ঢালে কোন একটি স্থানে আশ্রয় নিতে হয়। আবার বর্ষা অতিক্রান্ত হলে ফসল কাটা শেষ হয়ে গেলে পুনরায় গোঠ সমতলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তাদের এই স্থান পরিবর্তনের দৃশ্যটি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে – "গোঠ তখন দুমকা পাহাড় থেকে নেমে ধানবাদের কাছাকাছি পৌঁছেছে। পাহাড়ের কোলে কোলে টাড়-টিকরের ফসল ভাদ্র-আশ্বিনেই কাটা হয়ে যায়। ডাঙা জমিনের ধান কার্তিকের প্রথম হপ্তায়। তারপর কাটা হয় কানালী জমির ধান। আরও

গভীর অর্থাৎ শোল জমিনের ধানকাটা শেষ হতে পৌষের পয়লা হপ্তা। বর্ষাকালটা দুমকা পাহাড় অঞ্চলে থেকে আশ্বিন নাগাদ সমতলের উদ্দেশে নামতে শুরু করেছিল গোঠ। সমতলের ক্ষেতি থেকে ফসল ক্রমশ উধাও হয়েছে, গোঠও এগিয়েছে ক্রমশ।"[৫]

এই দীর্ঘ পরিক্রমায় ভকতদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে বহু মানুষের। দলের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিল দাহো ভকত। গোঠ নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়ানোর দরুণ তার অভিজ্ঞতার ভান্ডার ছিল নানা সুখ দুঃখের কাহিনীতে পূর্ণ – "কারো সে দাহো মামা, দাহো জ্যাঠা, কারো দাদু.....। ইন্দাস থানার জামশোল গাঁয়ের মাতঙ্গিনী বুড়ির সে ধরম-বেটা, আবার হাজারিবাগের বরাপানি গাঁয়ের শ্যামলাপানা বউটি তার এক বছরের মেয়েটিকে বিয়ে দেবার কড়ার করে আগাম জামাই পাতিয়ে ফেলেছে দাহোকে। আর, এই বিশাল মুলুক জুড়ে তার তো শ'দুশো সখা, স্যাঙাত, বন্ধু, গঙ্গাজল....। কোনটা মেলা-পার্বণে ঘটা করে পাতানো, কোনটা নেহাতই আপোষে।"[৬] পাশাপাশি লেখক দেখিয়েছেন যে সকাল থেকে সন্ধ্যা এমনকি সারারাত পর্যন্ত ক্লান্তি, আনন্দ, দুঃখ, ভাবনা-চিন্তা সমস্ত সময়টাই কাটে এই ভেড়াদের নিয়ে। সারাদিন ভেড়ার গোঠের পিছনে ঘুরেও বাগালদের শান্তি থাকে না। এমনকি দিনশেষে তারা যখন ডেরায় ফিরে আসে সন্ধ্যাবেলায়ও তাদের থাকে হাজারো কিসিমের কাজ – "ডেরায় ফিরে এসেও রেহাই নেই বাগলদের। বিমারী ভেড়াগুলোকে বেছে বেছে দাওয়াই গেলানো, হুড়ুম-দুড়ুম পথে দৌড়ুতে গিয়ে পায়ের নখ চিরে গেছে কোনও ভেড়ার, ক্ষতস্থানে মলম লাগানো, লড়াই করতে গিয়ে মাথা ফাটিয়েছে কেউ, 'কালাপুষ্প' গাছের পাতা ছেঁচে মাথায় ফেট্টি বেঁধে দেওয়া – বাগালদের কি কম কাজ !"[৭] সারা রাত ধরে চলে ভেড়াগুলিকে খুঁচিয়ে তোলার 'ডিপটি'। প্রাকৃতিক নিয়মে ওঠে দাঁড়ালে খানিকটা মলমূত্র ত্যাগ করবে ওরা। এইজন্যই মালিকের জমিতে তাদের ঠাঁই দেওয়া। মালিক তো আর এমনিতে ভকতদের সিধেপাতি দেয় না, চুক্তিমত ভেড়ার পেচ্ছাব, নাদি যদি জমিতে পড়ে তাহলে তিন বছর জমিতে কোন সার দিতে হবে না ফসল ফলবে চতুর্গুণ। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরও ভেড়াদের পরিচর্যার জন্য থাকে হাজারো কাজ – নুন দিয়ে দাঁত ঘষে দেওয়া, ভেড়াদের 'মুলকাই' করা ইত্যাদি। বাগালদের কাজে কমতি না থাকলেও, কমতি থাকে খাওয়া-দাওয়ায়। কোনরকমে একটু ভাত ও বেসনের ঘোল দিয়ে, কোনদিন বা সামান্য ব্যঞ্জনের ঝোল দিয়ে খেয়ে তাড়াতাড়ি ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়ে যায় এভাবেই দিন গুজরান করতে হয় তাদের। গোঠ জীবনের এই করুন দুর্দশার কথা লেখক উপন্যাসের চিত্রিত করেছেন। শুকনো মরশুমে জমিতে ডেরা পাতলে সিধেপাতি কিছু পাওয়া যায় ও কাছাকাছি দোকান বাজারও মেলে। বর্ষার দিনে গোঠ নিয়ে আশ্রয় নিতে হয় পাহাড়ের জঙ্গলে। সেখানে সিধেপাতি পাওয়া তো দূরের কথা পয়সা দিলেও চাল-ডাল-মশলা মেলা দুষ্কর। তখন এক বাধ্য হয়েই মুড়ি-চিড়া, শুকনো চাল, বনের ফলপাতা খেয়েই দিন কাটাতে হয়। আবার শুকনো মরশুমে সিধেপাতি যাও বা পাওয়া যায় বানিয়ে খাওয়ার সময় থাকে না। এদের কপালে ভালো মন্দ খাবার জোটে না বললেই চলে। মাংস খাওয়ার ইচ্ছে পুরোদমে থাকলেও মাংসের জোগাড় তারা করতে পারে না। তাই কালভদ্রে গোঠে যদি কোন মেহমান আসে তাদের সাধ হয়তো বা পূর্ণ হয়। গোঠের মালিক শ্রীকৃষ্ণ ভকত এলে চলে মাংস খাওয়ার তোড়জোড়। মাংস খাওয়ার সেই বীভৎস ও কদর্যময় দিকটিকে চিহ্নিত করা গেছে –

> "মাংস সংগ্রহের এই বুদ্ধিটা মন্দ নয়। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়। এই সুবাদে পাঁঠাকে খাসি করাও হল, মাংস খাওয়ার সাধও মিটল। এই যাযাবরী মাঠচরা মানুষগুলো তো বলতে গেলে মাংসের মুখ দেখতেই পায় না। মাঝেমধ্যে তাই একটুখানি মুখ বদলাবার এই ব্যবস্থাটি গোঠের ভেড়িয়ারদের মধ্যে প্রচলিত অনেক কালের রীতি। পনের-বিশটা ভেড়াকে খাসি করতেই ভরে এল জামবাটি। খেদাড়েং ভকত ফিরে এল। এক হাতে জ্বলন্ত ডিবরি, অন্য হাতে জামবাটি-ভর্তি লাল টকটকে বীচি। শ্রীকৃষ্ণ ভকত কোমর থেকে ঘাড়শুদ্ধু মুণ্ডুখানি বকের মতো তুলে ধরে ঝুঁকে পড়ে বাটির দিকে, দেখি দেখি। খেদাড়েং ভকত বাটি আর ডিবরিখানা শ্রীকৃষ্ণ ভকতের দৃষ্টির নাগালে নাবায়। অলক্ষ্যে বুঝি এক চিলতে শ্বাস টানে শ্রীকৃষ্ণ ভকত। কাঁচা মাংসের ঘ্রাণ নেয় বুঝি বলে, বাহ! খাসা চিজ! রাঁধ দেখি পিঁয়াজ-রসুন আর বেশি করে ঝাল দিয়ে। ডুমা ডুমা করে আলু কেটে দে। এই শীতের রাতে মাংস-ভাতের তুল্য চিজ নাই! ভিখারীই মাংসটা রাঁধ আজ। দাহো ভকত পরামর্শ দেয়।"[৮]

এটাই তাদের জীবনের বাস্তবতা। মাংস খাওয়ার অর্থাৎ ভকতদের রসনা তৃপ্তির পন্থা আমাদের কদর্যময় ও রুচিহীন বলে মনে হলেও এই জীবনেই তারা অভ্যস্ত আর এটাই চরম সত্য।

উপন্যাসে ভেড়িহারদের যে জীবনধারণের চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে কোন জায়গায় থিতু হয়ে থাকার জো নেই তাদের। বাংলা ও বিহার মুলক এর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ভেড়া চরিয়ে বেড়ায় কারণ এরা তো ভেড়ার মালিক নয়, কেউ কেউ মালিকের কাছ থেকে দাদন নিয়ে ভেড়ার দেখভালের কাজে নিযুক্ত হয়। চক্রবৃদ্ধির হারে বেড়ে যায় সুদ। আসল জটিলের এই অংক হয়ত বা এই ঋণ থেকে তারা জীবনে কখনো মুক্ত হতে পারবে না। ভিখারী ভকত বা মুন্সি ভকতের জীবন হয়ত মালিক শ্রীকৃষ্ণ ভকতের কাছে আজীবন বাঁধা হয়ে যায় – "বুড়ো বাপ ভিখারী ভকত এমন ক্লান্ত

চোখে তাকাল বার বার, মুনসী, বেটা রে, এই বয়েসে হামার একার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ভকতের খাতা খালি করা অসম্ভব ব্যাপার। সোহাড়িয়া, মুনসীর মা, বলে, হাঁ, ভেড়া-চারোয়া বনতে হামারা তগদিরকে লিখল। কে মিটাই! যা, তিন-তিনটি বেটা আমার, দুটো এখানে থাক, একটা যাক বাপের সাথ, জাতপেশায়। ভকত জাতের একশো পুরুষের ধারা এটা, বংশের একজন অন্তত ধারাটা চালু রাখুক।"[৯] ভেড়াগুলিকে কেন্দ্র করে এদের অর্থনীতি একটু সচল থাকে। ভেড়ার লোম বা ভেঁড়া বিক্রি করে সামান্য কিছু পয়সা হাতে পায়। এছাড়া যাদের জমিতে ভেড়াগুলি ঠাঁই পায় জমির মালিক কিছু সিধাপাতি বা কখনো সামান্যকিছু টাকা দিলে তা দিয়েই দিন গুজরান করে। পাশাপাশি চোর ডাকাতের উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পেতে সর্বদা সচেতন থাকতে হয় গোঠের সকলকে – "রাতের বেলায় গোঠে যেমন ডাকাতি হয়, দিনের বেলায় তেমনি রাহাজানি। এখন, এই শীতের মরসুমে, ক্ষেতে-মাঠে ফসল নেই। খাঁ-খাঁ করছে মাঠ। এই ঠায় দুপুরে মানুষ-জনও বিরল। বজ্জাত লোকেরা সুযোগ বুঝে হানা দিতে ছাড়ে না। ভেড়া কিংবা লোম বিক্রীর টাকা অধিকাংশই লেন-দেন হয়ে যায় মালিকের বাড়িতে।"[১০] ভেড়া কিংবা লোম বিক্রির টাকা মালিকের বাড়িতে লেনদেন হলেও কখনো মাঠ থেকে সরাসরি কিছু খুচরো কেনাবেচা হয়, এছাড়াও গোঠের খরচ চালানোর জন্য কিছু টাকা গোঠের ম্যাড়ালের কাছে সবসময় থাকে। অনেকসময় পুরো টাকা ডেরোয়াহার পাশে জমা থাকে। বদমাইসের দল ঐ অর্থের লোভেই আসে, কারণ ওরা জানে এই নির্জন দুপুরে জনহীন মাঠের মধ্যে ডেরোয়াহার নামক বয়স্ক মানুষটিকে তিন চারজন মিলে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারবে এবং বলপূর্বক তার থেকে টাকা পয়সাগুলোকে হাতিয়ে নিয়ে নির্বিঘ্নে কেটে পড়তে পারবে।

বর্ষার শুরুতেই ভেড়িহারদের জীবনে দুর্দিনের কালোছায়া ঘনিয়ে আসে। বাধ্য হয়েই তারা আশ্রয় নেয় পাহাড়ে। মাথার উপর না থাকে কোন আচ্ছাদন, না থাকে খিদে মেটাবার খাদ্য। পাহাড়ে কোন ক্ষেত থাকে না, সেই মত কোন মালিক-গিরস্থ নেই, সিধাপাতি নেই। সামান্য কিছু যা দানাপানি থাকে তা দিয়ে তো আর বেশিদিন চলে না, স্বাভাবিক ভাবেই খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। এই সময় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে ভিখারী ভকত। তাকে ফিরে যেতে বললেও সে রাজি হয় না। এই দুঃসময়ে সে ম্যাড়াল ও বাগালদের সঙ্গেই থাকতে চায় ভিখারী ভকত যদি এই বর্ষার জলে ভিজতে থাকে তাহলে আর তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। তাই পাহাড়ের কোটরে পাতা বিছিয়ে ভিখারী ভকতকে শুইয়ে দেওয়া হয়। গর্তের মুখে একটি জ্বরাজীর্ণ পলিথিন সিটকে টানিয়ে দেওয়া হয় যাতে জোলো হাওয়া তার গায়ে না লাগে। বড় করুণ অসহায় অবস্থা তাদের। পাহাড়ের ঝর্ণায় নতুন বর্ষার জল খেয়ে ভেড়া এবং বাগালদের পেটের অসুখ শুরু হয়। খাদ্যের অভাব দেখা দেয় – "খাদ্য বিহনে এখন মুনসীদের চলছে অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ। বনের শাকপাতা, কেঁদফল, কন্দ-আলু, যা পাচ্ছে তাই খেয়ে ক্ষিদে মেটাচ্ছে সবাই। এসব কি এক নাগাড়ে পেটে সয়! তার ওপর চলছে ধারাবাহিক বিনিদ্র দিন এবং রাত। চোখ ঢুলে আসছে ঘুমে, কিন্তু শোবার উপায় নেই। চারপাশ জল-কাদায় ছপছপে, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়েছে পাথর।"[১১] মুন্সি উপলব্ধি করতে পারে খিদের জ্বালার মত আগুন হয়তো আর দুনিয়ায় কিছু নেই। তাই সে বাধ্য হয়েই খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে নিজের ও বাগালদের জীবন বাঁচানোর জন্য। অর্থনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি চলে জীবন বাঁচানোর ঘোরতর সংকট।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বুর্জোয়া তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। 'সাতাত্তর' এর পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়, যারা শ্রমজীবী শ্রেণির সরকার বলে পরিচিত লাভ করে। ফলে শ্রমজীবী সহজ সরল মানুষগুলি আর হেনস্থার পাত্র হয়ে রইল না। ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্র ভেড়িহার মুন্সি ভকতের মুখ দিয়ে বাংলার শ্রমজীবী মানুষের সরকারের কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। মুন্সী তার মা সোহাড়িয়াকে গল্প শোনায় – "সে এক আজব দেশ, মা-গো! সেখানে কমনিশ সরকার। সেখানে প্রভুদয়ালদের অত জুলুম নেই। কথায় কথায় ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবার রেওয়াজ নেই। জমিন্দারের অমন নিজস্ব লেঠেল বাহিনী নেই। জাতপাতের দাঙ্গা নেই। কারণে-অকারণে গরীব মানুষকে মাথা উল্টে ঝুলিয়ে দেওয়া নেই। ওখানে আছে ইস্‌টাইক্। ওখানে মজুর-কামিনেরা সবাই কথায় কথায় সবকিছু বন্ধ করে দেয়। সে মুলুকে প্রভুদয়ালরা গরীবদের সমঝে চলে।"[১২] অর্থাৎ প্রভু দয়াল সিং এর মত শাসকের অত্যাচার ও বেঠবেগারী 'বাঙাল মূলকের' মানুষদের দিতে হয় না। তারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে।

ভেড়ার পাল নিয়ে চলার পথে মুন্সিরা লক্ষ্য করেছে তাদের ডেরার পাশের ফাঁকা জমিগুলিতে ভোটের প্রচারের জন্য মিটিং হতে থাকে। 'বাঁকুড়া', 'পুরুল্যা' থেকে লোক এসে মিটিংয়ে যোগ দেয়। এমনকি ভোটের দিন সকলে ভোট দেওয়ার জন্য ভোট কেন্দ্রের দিকে রওনা দেয়। এই দৃশ্যগুলির সঙ্গে তারা ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠে। মুন্সিদের মুলুকে ভোট হলেও তাদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কারণ –

> "চামার, দুসাদ, ভেড়িহার, হরিজন-এদের সাধারণতঃ ভোট-কেন্দ্র অবধি পৌঁছুবার দরকার পড়ে না। লড়াইটা মূলত হয় প্রভুদয়াল সিং-দের সঙ্গে বুটি কিংবা মাল্লু সিং-দের। যা- কিছু উত্তেজনার আগুন, ওরাই পোহায়। যা কিছু লাঠালাঠি বাধে, সে ওদেরই ভাড়াটে

> গুণ্ডাদের মধ্যে। নির্দিষ্ট দিনে ভোটবাবুরা আসেন। প্রভুদয়ালদের বৈঠকখানায় ডেরা পাতেন, খাঁটি ঘিয়ের লুচি-পরোটা, হালুয়া, মাংস ইত্যাদি সহযোগে খানাপিনা সারেন। ভোটের দিন সকাল সকাল ভোট সেরে ফেলে ভানুপরতাপ এবং তার চেলারা। ভোটবাবুরা ফের একপ্রস্থ ভুরিভোজ সেরে রওনা দেন সদরের দিকে। চামার, হরিজনরা দূর থেকে দেখে যায় পুরো মশকরাটা।"[১৩]

নিম্নবর্গের মানুষের পাশে উচ্চবর্গের মানুষ ভোট দিতে দাঁড়াতে পারবে না এই কারণে ভোট বানচাল হতে বসেছিল। এমতাবস্থায় সদর থেকে সাহেবরা এলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভোট পর্বকে সমাপ্ত করে দেয়, কারণ চামার, দুসাদ, হরিজনদের আর কষ্ট করে ভোট দিতে হয়নি। ভোটারদের অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়।

বিহার মুলকে প্রভুদয়াল সিং এর মত নিষ্ঠুর শাসক থাকার কারণে ভকত সম্প্রদায়ের এত দুর্দশার শেষ থাকে না। যে কারণে রুকমিনিয়া ও রুপলাল ভকতের পিতা ললন ভকত ও তার স্ত্রীকে জমি বিবাদের জেরে প্রাণ দিতে হয়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষগুলির মধ্যেও আত্ম মর্যাদা রক্ষার চেতনার উত্তরণ ঘটে। এখন শ্রমজীবী মানুষেরাও নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে থাকে –

> "আগের মতো যখন-তখন এসে শতচক্ষুর সুমুখে একজন চামার, দুসাদ কিংবা ভকতকে ধরে নিয়ে যাওয়া, কিংবা বন্দুক ছুঁড়ে খুন করে ফেলাটা অন্তত বেলাউর গাঁয়ে সম্ভব নয় আজকের দিনে। মরবার আগে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে অন্তত সেই পরিস্থিতিটা যৎসামান্য বানিয়ে দিয়ে গেছে রুকমিনিয়ার দাদা রূপলাল ভকত। এখন প্রকাশ্যে হামলা হলে লাঠি নিয়ে বাধা দিতে এগিয়ে আসবে, এমন মরদ বেলাউর গাঁয়ে তৈরি হয়েছে। থানা লক্ষ করে দৌড়বে এমন জেনানাও মিলে যাবে দু'চারটে। মামলা উঠলে কলিজা মুঠোয় নিয়েও ঠিকঠাক সাক্ষী দেবে, এমন লোকও কিছু তৈরি করা গেছে। ভেড়ুয়া যে নেই, এমনটা নয়। ভেড়ুয়াই বেশি। তবে অবস্থা এখন, বেলাউর গাঁয়ে, অনেকখানিই বদলেছে। এখন এক্কেবারে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়াটা আর সম্ভব নয় প্রভুদয়ালের পক্ষে। রূপলালকে খুন করেই সেটা মালুম পেয়েছে ও। যদিও হাতেনাতে প্রমাণ না থাকায় হয়ত মামলায় শেষ অবধি বেঁচে যাবে প্রভুদয়ালের দল, তবুও মামলাটা নিয়মিত চলছে। পুলিশকে টাকা খাইয়েও কেসটা শেষ করে দিতে পারেনি থানাতে। মামলা গড়িয়েছে সেশন কোর্ট অবধি। আসামীর কাঠগড়ায় নিয়মিত দাঁড়াতে হচ্ছে প্রভুদয়াল, ভানুপরতাপ আর তাদের চেলাগুলোকে।"[১৪]

আদিবাসী অধ্যুষিত বিহারের বেশকিছু এলাকার মানুষ আজ সংঘবদ্ধভাবে লড়াই করতে প্রস্তুত। ভেড়ার গোঠের পেছনে ঘুরে জীবনটাকে তারা নষ্ট করতে চায় না। প্রভু দয়ালের রক্ষিতা পার্বতী, রাচির পিয়ারীলাল, পরসাদ সকলেই গোপনে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। রুকমিনিয়া তার দাদার পথকে অনুসরণ করে জঙ্গি দলে যোগ দেয়। যদিও এই জঙ্গি দল ছিল নকশালবাদী আন্দোলনের পথস্রষ্টা, তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল সাধারণ মানুষের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করা। উপন্যাসে নকশালপন্থীরা কিছুটা হলেও নিম্নশ্রেণির মানুষের মধ্যে অধিকার বোধের লড়াইকে জাগ্রত করতে পেরেছিল।

চারণভূমি উপন্যাসে ভকতদের যে জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে তাতে ভেড়িহাদের জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য-হতাশা-বেদনা-যন্ত্রনা ও অত্যাচারকে ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি ভকত শ্রেণির সৃষ্টির ইতিহাস ও এই মানুষগুলির বিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র উঠে এসেছে। আমরা তাদের সেই সাংস্কৃতিক দিকটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। ভকতরা যাযাবরের মতো জীবন কাটায়। তাদের এই জীবন কাটানোর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ভেড়িহারদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ দাহো ভকত তাদের জনম ইতিহাসের কথা জানায় –

> "ভকতদের পূর্বপুরুষ ছিল ক্ষেত্রী, অর্থাৎ কিনা ক্ষত্রিয়। হাতিয়ার চালিয়ে লড়াই করাই ছিল তাদের পেশা। কত দেশ মুলুক জয় করেছিল তারা, পরাজিত শত্রুর পায়ে পরিয়েছিল শেকল, কব্জা করেছিল তাদের ধনসম্পদ, ক্ষেতি-জমিন, ভইস-বয়েল আর সুরতওয়ালী ঔরত। তো মহাঋষি পরশুরাম করলেন পণ, দুনিয়াকে সাতবার নিঃক্ষত্রিয় করবেন। করেছিলেনও তাই। তাঁর হাতে ক্ষেত্রী জাতটা দুনিয়া থেকে মুছে গিয়েছিল সাতবার। সেই ঘোর সংকটকালে জনা কয় ক্ষেত্রী গিয়ে লুকিয়ে থাকে দুর্গম পাহাড়ে। পাহাড়িয়া মেষপালকরা ওদের আশ্রয় দেয় বিপদের দিনে। কিন্তু পরশুরামের সেনারা ঐ দুর্গম পাহাড়ের দিকেও এগিয়ে আসতে থাকে। জীবন বাঁচাবার তাগিদে, কোনও উপায় না দেখে, ক্ষেত্রীরা ভেড়া-চারোয়া সেজে ভেড়া চরাতে থাকে পাহাড়ের ঢালে, পরশুরামকে স্রেফ ধোঁকা দেবার জন্য। পরশুরামের সৈন্যরা এসে শুধোয়, তোরা কে রে? ক্ষেত্রীরা বলে, আমরা ভকত-জাত। ভেড়া-চারোয়া। সৈন্যরা বলে, তোরা ক্ষেত্রী নয় তো? ক্ষেত্রীরা বলে, না না আমরা ভেড়া-চারোয়া। পরশুরামের সৈন্যরা ধোঁকা

খেয়ে ফিরে যায়। ক্ষেত্রীরা দীর্ঘকাল মেষপালকদের আশ্রয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে মেষপালক বনে যায়। ভেড়া-চারোয়া। ভেড়ার পাল নিয়ে ক্রমশ নেমে আসে সমতলে। ততদিনে বাল-বাচ্চা নিয়ে তারা সংখ্যায় অনেক। শুরু হয় তাদের ধারাবাহিক পথ-পরিক্রমা। ভেড়ার পালের পিছু পিছু তারা হেঁটে বেড়ায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। অতিক্রম করে যায় একের পর এক জনপদ, নদী, দরিয়া, অরণ্য....। ঋতুচক্রের সঙ্গে পাক খেতে খেতে তারা হাঁটে, স্থান বদলায়, থামে না তিলেকের তরে। থামবার উপায় নেই তাদের জীবনে।"[১৫]

আসলে দাহো ভকত তার আশি বছরের জীবন অভিজ্ঞতায় দেখেছে মানুষ জাতের কোথাও থিতু হওয়ার জায়গা নেই। আবার যেহেতু তারা ভকত শ্রেণি ভেড়া চরানোই তাদের কাজ তারা তো এক জায়গায় বেশি দিন বসে থাকতে পারে না। দাহো ভকতের ঠাকুরদা শিউকূজন বলত – "এ দুনিয়ায় আদমিলোগই তো 'দো দিনকে মেহমান'। চিরদিনের মতো থিতু হওয়ার জন্য, শিকড় চারাবার জন্য থোড়াই এসেছে আদমিলোগ ! বলত, লোগকে দোনো গোড়মে বিধাতা পুরুষনে পাহিয়া লাগাঅল বা"[১৬] মাঝে মাঝে দাহো ভকতও উগরে দিত ঠাকুরদার সেই মুখের কথা। 'ভকত জাতে জনম লিয়েছিস দৌড়বি নাই, মানুষ জাতে জনম লিয়েছিস দৌড়বি নাই?'

ভকত সম্প্রদায়ের মানুষগুলিকে সারা জীবন খোলা আকাশের নিচে দিনরাত কাটাতে হয় বলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে কিছু সংস্কার বাসা বাঁধে। প্রকৃতির বুকে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটানোর দরুণ এদের মধ্যে জন্ম নেয় বেশ কিছু কুসংস্কার –

"খোলা আকাশের তলায় হাঁটতে হাঁটতে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়, রাতে-ভিতে, প্রলয়ে-প্লাবনে, তাদের মধ্যে অলৌকিক বিশ্বাস প্রবল। ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী, জন্তু-জানোয়ার, রোগ-ব্যাধি আর প্রকৃতির হাজারো খামখেয়ালিপনায় একেবারে কাবু হয়ে থাকে বেচারারা। কি করতে কি হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় সর্বদাই তটস্থ। তারা কথায় কথায় পুজো লাগায়, মানসিক করে, অশুভ শক্তিগুলিকে তুষ্ট করবার জন্য হরেক কিসিমের টোটকা, মন্ত্র, তেলপড়া, জলপড়া, এসব তাদের দৈনন্দিন আচারের মধ্যেই পড়ে। চারপাশে আকাশ-বাতাস, গাছপালা, পশু-পাখির মধ্যে শুভ-অশুভ লক্ষণগুলি আবিষ্কার করে, পড়তে চেষ্টা করে জল-স্থল-আকাশের দুর্বোধ্য সঙ্কেতগুলিকে।"[১৭]

গোঠে তাদের গুনিন হিসেবে কাজ করে বিষমি ভকত। খোলা আকাশের নিচে দিন গুজরান করতে হয় বলে এরা কিছু প্রাকৃতিক ঘটনাকে সংস্কার বলে মনে করে। যেমন কয়েৎবেল গাছে বসে একটি কাক তার বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে দেখে বিষমি চিৎকার করে বলে ওঠে –'কাগে আধার বাঁটছে আইজ গোঠে মেহমান আইবেক' আবার শিমুল গাছে শকুনের পাখা ঝাপটানো দেখে বলছে পশুহানি ঘটবে অর্থাৎ শকুন মরা পশুর লালসায় ডানা ঝাপটাচ্ছে। বর্ষার দুর্দিনে ভেড়া ও ভেড়িহার উভয়ের জীবনেই ঘোর দুর্যোগ নেমে আসে, খাদ্যাভাবে ও পেটের রোগে কিছু ভেড়া এই সময় মারা যায়।কাজেই বিষমি ভকত তার বিশ্বাস অনুযায়ী বাড়িয়ে তোলে ক্রিয়া কর্মের তৎপরতা –

"যত ঘনিয়ে আসছে দুর্যোগ, তার মন্ত্র পড়া, ধুনিবাঁধা, ঝাড়ফুঁক, সবকিছুই বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন। ফুটো আকাশ, বজ্র-বিদ্যুৎ, জন্তু-জানবার, ভূত-পেরেত, সবকিছুর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে তার একক এবং আপোষহীন লড়াই। রোজ বার-তিনেক পুজোয় বসছে সে। যখন-তখন ভেড়া এবং ভেড়িয়ারদের গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে মন্ত্রঃপূত জল কিংবা ধুলো। সন্ধ্যের পর ভেড়া, ভেড়িয়ার এমনকি কুকুরগুলোকেও এক বেষ্টনীর মধ্যে আটকে দিয়ে আচ্ছা করে পড়ে দিচ্ছে মন্ত্র। বেষ্টনী প্রদক্ষিণ করে ছড়িয়ে দিচ্ছে ধুলো। ব্যস, এবার সারা রাতের জন্য নিশ্চিন্ত, নিরাপদ। ঐ মন্ত্রঃপূত বেষ্টনীর মধ্যে আর একটি মাছিও গলে আসতে পারবে না।"[১৮]

আর পাঁচটা সাধারণ সম্প্রদায়ের মতো ভকতদের মধ্যে 'মাঘ-শিরি পঞ্চমী' নামে একটি পূজার প্রচলন ছিল। এই দিনটি গোঠের বাগালদের কাছে খুবই শুভ। এই শুভদিনে তারা কিছু আচার নিয়ম পালন করার মধ্য দিয়ে ভেড়াদের 'মুড়' করা অর্থাৎ লোম ছাটাই এর কাজ শুরু করে। খুব ভোরে বাগালদের দল স্নান সেরে নেয়। মাঠের মাঝখানটায় খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে গোবরজল দিয়ে পুরু করে লেপে দিয়ে সেখানে ধুপ-ধুনো আতপচাল, চিনি, কলা, বাতাসা আনুষাঙ্গিক দ্রব্য গোলাকার করে সাজিয়ে রাখে পূজার জন্য। রামনা ভকত যেহেতু গোঠের ম্যাড়াল তাই ভিজে কাপড়ে পূজাটা তাকেই করতে হয়। মাটির হাঁড়িতে আতপ চাল ও ভেড়ার দুধ দিয়ে পরমান্ন তৈরী করে 'মাঠ দেওতা'কে নৈবেদ্য অর্পণ করে। আসলে সূর্য দেবতার উদ্দেশ্যেই এদের এই পূজা। অবশিষ্ট পরমান্ন সকলে ভাগ করে খায়। মাঘ-শিরি পঞ্চমী তিথি থেকে শুরু করে আগামী মাস ফাল্গুন মাস পর্যন্ত মুড় করায় কাজ চলতে থাকে। আবার পাহাড়ের ঢালে ভিজতে ভিজতে করে নাগ পঞ্চমীর ব্রত। নৈবেদ্য দেওয়ার মতো কিছু না থাকলেও শুকনো চাল কে উৎসর্গ করে, তাই সকলে প্রসাদরূপে চিবিয়ে খায়। তাদের বিশ্বাস নাগরাজকে তুষ্ট করতে না পারলে গোঠের

ঝাড়বংশ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভেড়ার লোমকাটা বা পাহাড়ি অঞ্চলে সাপখোপের হাত থেকে ভেড়ার গোঠকে বাঁচানোর জন্য তারা যে সংস্কার পালন করে আসছে তা এখানে চিত্রিত।

এদের জীবনের সুখ-দুঃখ, অন্যায়-অত্যাচারকে দেখানোর পাশাপাশি ভাষা ব্যবহারেও দক্ষতা দেখিয়েছেন। রাঁচি, হাজারীবাগ অঞ্চলের হিন্দি ভাষার ব্যবহারও উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেছে।লেখকের ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা চরিত্রগুলির দুঃখ যন্ত্রণাকে জীবন্ত করে তুলেছে –

- "দাহো বলে, যে ক'দিন বাঁচি উয়াকে লিজের পাশে পাশেই রাখব, শিক্ষা দিব, ছ'মাস গোঠের সাথ ঘুরল্যে উ বদলাই যাব্যেক।"[১৯]
- রুকমিনিয়া বলে - "হামনে কে তোহরা লেখা একোই জাগা মে গোল বানাচুক নেহি ঘুমত্ত। হামনেকে সিধা রাস্তা ধরকে চলতানি যা। সিধা রাস্তা কা অভ্ হোঙ্গী।"[২০]

সত্তর উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হলেন ভগীরথ মিশ্র। তিনি তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিম্নবর্গের জীবনচিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে আদিবাসী, ভকত, বাউরি, ডোম, লোধা, লোহার, ভেড়িহারদের জীবনচিত্র। উপন্যাসের পটভূমি সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক ও ভাষার ব্যবহার নিম্নবর্গের জীবনের দিকেই লক্ষ্য রেখে গড়ে উঠেছে। তাঁর লেখনীর গুণে অন্ত্যজ জীবন নির্ভর চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রান্তিকায়িত মানুষদের নিয়ে লেখা তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস যেন 'ব্রাত্য জীবনের রুদ্ধ সংগীত'হয়ে উঠেছে। আসলে লেখক তাঁর উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবনচিত্রকে তুলে ধরার জন্য জীবনের বেশিরভাগ সময়ই গ্রামীণ অন্তেবাসি মানুষগুলোর সঙ্গে কাটিয়েছেন। খুব সহজেই একাত্ম হয়ে গেছেন এদের সঙ্গে, তাই খুব কাছ থেকে দেখেছেন এদের জীবন সংগ্রামকে। কথাসাহিত্যে যারা এতদিন ব্রাত্য ছিল লেখকের লেখনীর স্পর্শে এই অজ্ঞাত পরিচয় নাম না জানা মানুষগুলি সাহিত্যে স্থান পেয়েছে।অন্ত্যজ জীবনের স্বরূপকে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশকালের প্রেক্ষাপটে এদের জীবনের পরিবর্তিত রূপকেউ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাই সামগ্রিকভাবে বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের স্বরূপ সন্ধানী উপন্যাসগুলি বিশিষ্টতার দাবি রাখ।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থ নির্দেশ

[1] স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৫, পৃঃ ৩৪ থেকে সংগৃহীত Encyclopedia of the Social Science Vol. – 15, 16, 17।

[2] বর্তমান ভারত, শূদ্র জাগরণ, স্বামী বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ১৬৬।

[3] ভগীরথ মিশ্র, 'আমার গল্পভাবনার একদিক', 'উত্তরাধিকার' – সাম্প্রতিক বাংলা গল্প সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৬, পৃঃ ৩২।

[4] চারণভূমি (দুটি উপন্যাস চারণভূমি/জানগুরু), ভগীরথ মিশ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৬, পৃঃ ৪৪-৪৫।

[5] তদেব, ১৫

[6] তদেব, ১৬

[7] তদেব, ২১-২২

[8] তদেব, ২৭-২৯।

[9] তদেব, ১৫।

[10] তদেব, ৫০।

[11] তদেব, ২০৮-২০৯।

[12] তদেব, ১৭০।

[13] তদেব, ১৭৯।

[14] তদেব, ২১৭।

[15] তদেব, ৪৫-৪৬।

[16] তদেব, ৪৬।

[17] তদেব, ২৩।

[18] তদেব, ২০৪।

[19] তদেব, ৪৯।

[20] তদেব, ২৩০।

Cite this article

Sarkar, K. (2026). Reflection of Marginality in Bhagirath Mishra's Novel: Charanbhumi: **ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাসে প্রান্তিকতার প্রতিচ্ছবি: চারণভূমি.** *Research Review Journal of Interdisciplinary Studies*, *2*(1), 08-16. https://doi.org/10.31305/rrjis.2026.v2.n1.002